Bhatter College

Dantan,Paschim Madinipur

Dept:-Music

Professor Name:-Dr. Santanu Tewari

Semester-II

Music Honours-2020

CC-3: Introduction of Rabindra Sangeet and Theoretical Knowledge of Raga's ,Tala's and Notation(Theoretical)

C3T: Introduction of Rabindra Sangeet and Theoretical Knowledge of Raga's ,Tala's and Notation(Theoretical)

Course Contents:-

2. Musical Atmosphere of Jorasanko Tagore's Place
3. Introduction to the Music master's of Rabindranath

Santanu Tewari

Dated:- 23.03.2020

Signature of H.O.D

১৩৪৪) প্রকাশিত হয়েছিল। 'হে বিরহী হায়' এই গানটির স্বরলিপি শৈলজারঞ্জন মজুমদার দ্বারা ১৩৪২ সালের জৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই নৃত্যনাট্যের গানগুলি ১৯ নং স্বরবিতানে সংকলিত হয়েছে। এই নৃত্যনাট্যের প্রধান বিষয়বস্তু হল প্রেমের দ্বন্দ্ব। ৪৬ টি গান এই নৃত্যনাট্যে আছে। এই নৃত্যনাট্যের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গান হ'ল – (১) আমার জীবনপাত্র - ভৈরব/ভৈরবী - দাদ্‌রা, (২) ন্যায় অন্যায় জানি নে - কাফী - দাদ্‌রা, (৩) মায়াবন বিহারিনী হরিণী - ইমন কল্যাণ - কাহারবা , (৪) ক্ষমিতে পারিলাম না - দেশ - ঝম্পক।

৩৯২। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীর সাংগীতিক পরিবেশ রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল?

উঃ পরিবেশ মানুষকে বড় করে। কোন কিছু সৃষ্টির নেপথ্যে পরিবেশের ভূমিকা অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাঁর বাড়ীর সাংগীতিক পরিমন্ডল তাঁকে বৃহৎ সৃষ্টিতে প্রেরণা জুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে। ওই সময় কলকাতার অভিজাত পরিবারে শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা হত। ঠাকুর পরিবারে সে সময় প্রত্যহ শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা হত এবং ঠাকুর পরিবার শাস্ত্রীয় সংগীত ও পাশ্চাত্য সংগীতের চর্চায় প্রসিদ্ধ ছিল। ঠাকুর পরিবারের ছেলে মেয়েদের সংগীত শিক্ষার জন্য সবসময় গৃহশিক্ষক থাকত। বিষ্ণু চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের সংগীত শিক্ষক ছিলেন। ঠাকুর পরিবারের সংগীত চর্চা রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে সংগীতের বিশেষ প্রভাব পড়ে। বিষ্ণু চক্রবর্তী শাস্ত্রীয় সংগীতে ওস্তাদ হওয়া সত্ত্বেও তিনি গ্রামের সহজ সহজ কবিতাকে রাগের ধুন বসিয়ে সহজ ছন্দে সংগীত শিক্ষা দিতেন। অলঙ্কার অর্থাৎ সা-রে-গা-মা শিখলে বা অভ্যাস করলে যদি শিশুর মনে সংগীতের প্রতি বিমুখ ভাব আসে সে কারণে তিনি বাংলা ছড়াতে সুর বসিয়ে সেই গান শেখাতেন। ঠাকুর পরিবারের ছেলেমেয়েরা এই পদ্ধতিতে গান শিখতেন। বিষ্ণু চক্রবর্তী ছাড়াও ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য সংগীত শিক্ষকদের মধ্যে যদুভট্ট, শ্রীকন্ঠ সিংহ, রাধিকা গোস্বামী, শ্যামসুন্দর মিশ্র ও রাধাপ্রসাদ মিশ্র (সেতার বাদক) প্রমুখ উল্লেখ্য। রবীন্দ্রনাথের বড় দাদারা শাস্ত্রীয় সংগীতের শিক্ষা করতেন। সোমেন্দ্রনাথ বাংলায় হিন্দুস্থানী রাগের অবলম্বনে ব্রহ্ম সংগীত রচনা করেন। সেই রচনার কিছু কিছু গান ব্রহ্ম উপাসনায় গাওয়া হত। দ্বিজেন্দ্রনাথ বাঁশী ও অরগ্যান ভাল বাজাতেন। এই পরিবারে ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশের বড় বড় ওস্তাদ (গায়ক বাদক) এসে গান শেখাতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় শাস্ত্রীয় সংগীতের জলসা হত। দুর্গা পুজার সময় আগমনী ও বিজয়া গানও হত। বালক রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রনাথ নামে এক চাকরের তত্ত্বাবধানে থাকতেন। সঙ্গে বসে প্রায়ই হাল্কা চালের গান শুনতেন এবং আরও অন্যান্যদের সঙ্গে বসে 'কৃত্তিবাসের'

সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনতেন। এই রামায়ণ সুর করে গাওয়া হত। কখনো কখনো কিশোরী চট্টোপাধ্যায় (কবির পিতার বন্ধু) এসে সুর করে পুরো রামায়ণ গানের পাঁচালী করে শোনাতেন। অনেক অপরিচিত গায়কও এই পরিবারে এসে গান শুনিয়েছেন। মাঝে মাঝে যাত্রার আসরও বসত। এই আসরে ছোটদের প্রবেশের অধিকার ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময়ে তিনি বিডন স্ট্রীটের পাশে একটি ঘর ভাড়া করে সেখানে ওস্তাদদের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষা শুরু করেন এবং কন্ঠ সাধনা শুরু করেন। তিনি পিয়ানো বাজাতেন। ফরাসী গানও তিনি কিছু কিছু জানতেন। তিনি "হাল মেঁ রবে রবা" এই গানটি প্রায়ই করতেন। এই গানের অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি প্রতিভা "হা কী দশা হ'ল আমার" গানটি রচনা করেন এবং 'শ্যামা'তে "হায় এ কী সমাপন" এই গান রচনা করেন। সংগীতের ব্যাপারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর পুত্রদের উৎসাহীত করতেন। বিশুদ্ধ সংগীত সাধনা করার জন্য একবার দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে মাঘোৎসব উপলক্ষে রচিত "নয়ন তোমায় পায়না দেখিতে" গানটি শুনে রবীন্দ্রনাথ, পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে রাজ সম্মান স্বরূপ পাঁচ শত টাকা পেয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন "দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত তবে কবিকে তো তারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার সম্ভাবনা নেই — তখন আমাকেই সেই কাজ করিতে হইবে" (জীবন স্মৃতি, হিমালয় যাত্রা')। শুধুমাত্র ছেলেমেয়েদের সাহিত্য ও সংগীত শিক্ষার ব্যাপারেই যে তাঁর উৎসাহ ছিল তা নয় মৃতপ্রায় ভারতীয় সংগীতকে নতুনভাবে আবার ফিরিয়ে আনার জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। তাঁর উদার মন কেবল ভারতীয় সংগীতেই আবদ্ধ ছিল তা নয়। তিনি পাশ্চাত্য সংগীত, পিয়ানো, অরগ্যান প্রভৃতি শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতেন এবং তাঁর পরিবারে এ সবের চর্চাও হত। সে সময় সম্ভ্রান্ত পরিবারে মহিলাদের সংগীত চর্চা করা ছিল নিন্দনীয় অপরাধ। কিন্তু ঠাকুর পরিবারে মহিলাদের জন্য এমন কোন নিয়ম ছিল না। এই পরিবারের মহিলারা গান শিখতেন কন্ঠ সাধনা করতেন এবং সকলকে গানও শুনাতেন। হেমেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে সংগীতে উৎসাহ দিতেন এবং ওস্তাদদের কাছে সংগীতও শেখাতেন। হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ কন্যা তাঁর পিতার উৎসাহে সংগীতে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। তাঁর তৃতীয় কন্যা অভিজ্ঞাদেবী গৃহশিক্ষক যদুভট্টের কাছে গান শিখতেন এবং তাঁকে পাশ্চাত্য সংগীত সেখানোর জন্য বাহির থেকে সংগীত শিক্ষক আসতেন। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীও গানবাজনা জানতেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা

সরলাদেবীও সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা ইন্দিরাদেবী ঠাকুর পরিবারের গায়িকা রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

এ কথা মনে রাখা দরকার যে ঠাকুর পরিবারে এ ধরনের সাংগীতিক পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ লালিত পালিত হওয়া সত্ত্বেও পরিবারের অন্যান্যদের মত তিনি নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে সংগীত শেখেন নি। কখনো নিয়ম অনুযায়ী সংগীত সাধনা করেন নি। কবির সংগীত শিক্ষার অধিকাংশই অপ্রত্যক্ষ রূপে সম্পূর্ণ হয়েছিল। নিয়ম করে চলা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁর সংগীত শিক্ষা নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে না হলেও তিনি যে সময়ে ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে সময়ে ঠাকুর পরিবার সংগীত চর্চায় ডুবে ছিল। তাই কবি শিশুকাল থেকেই সংগীত শুনতে শুনতে সংগীতকার হয়ে গিয়েছিলেন।

৩৯৩। রবীন্দ্রনাথের জীবনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব আলোচনা কর।

উঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঘুমন্ত সংগীত সত্ত্বাকে জাগিয়েছিলেন। কবি স্বয়ং বলেছিলেন "সেদিন এই যে আমার সমস্ত শক্তিকে এমন দুর্দম উৎসাহে দৌড় করাইয়াছিলেন তাহার সারথি ছিলেন জ্যোতিদাদা। .... সকল পুরাণো কায়দার ভিড়ের মধ্যে জ্যোতিদাদা এনেছিলেন নির্জলা নতুন মন নিয়ে। .... সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায় বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। ..... আমি (বারো বৎসরের ছোট হইলেও) অবাধে তাঁহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবত্ত হইতাম; তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না। .... এক সময় পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়া ছিলেন, প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলি নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত— আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল। বাল্যাবস্থাতেও রবীন্দ্রনাথের অনেক সংগীত গুণির কাছে সংগীত শিক্ষা করার সুযোগ হয়েছিল। পরোক্ষভাবে ঐসব সংগীত গুণিরও প্রভাব পড়েছিল। ফলস্বরূপ পরিণত বয়সে তাঁর সংগীত রচনা। একথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত গুরু ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। যিনি বাল্যাবস্থা থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত কবিকে সংগীত শিক্ষা দিয়েছিলেন। কোন বাঁধাধরা নিয়মে নয়। তাই কবি বলেছেন, "জ্যোতিদাদা, যাঁকে আসি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে আমাকে কোন বাঁধন পরাননি।"... আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্ত বিকাশের সহায়তা করেছে।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২০৯)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরম উদার অভিভাবকত্ব ও উৎসাহ প্রদানই রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা বিকাশের সহায়তা করেছিল। সংগীত সম্বন্ধে শিক্ষা, বাংলা গানে

পাশ্চাত্য সুর সংযোজন, গীতিনাট্যের রচনা, বিভিন্ন ভাষার সংগীতের আধারে বাংলা গান রচনা, নতুন নতুন ছন্দের প্রবর্তন, ইত্যাদি প্রত্যেক ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অমূল্য অবদান অনস্বীকার্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই রবীন্দ্রনাথকে হাতে ধরে সংগীত জগতে নিয়ে আসেন, এবং রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সংগীত ভাণ্ডার হ'ল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারের ফসল।

৩৯৪। রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিষ্ণু চক্রবর্তীর প্রভাব সম্বন্ধে লেখ।

উঃ রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম সংগীত শিক্ষক ছিলেন বিষ্ণু চক্রবর্তী। বিষ্ণু চক্রবর্তী আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক ছিলেন। তিনি মুখ্যতঃ ধ্রুপদ তথা হিন্দুস্থানী সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। বিষ্ণু চক্রবর্তীর সংগীত শিক্ষা পদ্ধতি ছিল একেবারে নতুন। তিনি শিশুদের অতি পরিচিত ছড়ায় হিন্দুস্থানী রাগ রাগিণীকে সহজ সরল সুরে ও তালে রচনা করে শিশুদের শেখাতেন। এর ফলে বাংলার সাহিত্য ও ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে শিশুদের পরিচয় ঘটে। এইভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথ সহ অন্যান্য শিশুদের মনে সাহিত্য ও সংগীতের বীজ রোপণ করেছিলেন। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে কবি লিখেছেন, "বিষ্ণুর কাছে দিশি গান শুরু হয়েছে শিশুকাল থেকে। গানের এই পাঠশালায় আমাদের ভর্তি হতে হলো। ...

শিশুদের মন ভোলানো প্রথম সাহিত্য — শেখানো হয় মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে শিশুদের মন ভোলানো গান শেখানোর শুরু সেই ছড়ায় এইটে আমাদের উপর দিয়ে পরখ করানো হয়েছিল।" (রবীন্দ্র রচনাবলী ১০ম খণ্ড পৃঃ ১৪২ —১৪৩) উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিক্ষা পদ্ধতিতে এই রকম সহজ সরল নিয়ম সমর্থন করা হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন প্রকার সংকীর্ণতার প্রশ্রয় দেন নি। এর কারণ সম্ভবত তাঁর প্রথম গুরু বিষ্ণু চক্রবর্তীর পরোক্ষ প্রভাবের ফলে।

৩৯৫। রবীন্দ্রনাথের জীবনে শ্রীকণ্ঠ সিংহের প্রভাব আলোচনা কর।

উঃ শ্রীকণ্ঠ সিংহ ছিলেন ঠাকুর পরিবারের প্রিয় বন্ধু। বৃদ্ধ শ্রীকণ্ঠ সিংহের মতো এমন শ্রোতা রবীন্দ্রনাথের জীবনে আসে নি। রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখেছেন,"এই সময় একটি শ্রোতা লাভ করেছিলাম এমন শ্রোতা আর পাইব না। ভালো লাগিবার শক্তি ইহাঁর এতই অসাধারণ যে মাসিক পত্রের সংক্ষিপ্ত সমালোচক - পদলাভের ইনি একেবারেই অযোগ্য। বৃদ্ধ একেবারে সুপক্ক বোম্বাই আমটির মতো — অম্লরসের আভাস মাত্র বর্জিত — তাঁহার স্বভাবের কোথায় এতটুকু আঁশও ছিল না। মাথা ভরা টাক, গোঁফদাঁড়িকামানো স্নিগ্ধ মধুর মুখ, মুখ বিবরের মধ্যে দন্তের কোন বালাই ছিল না, বড়ো বড়ো দুই চক্ষু অবিরাম হাস্যে সমুজ্জ্বল। তাঁহার বাম পার্শ্বের নিত্য সঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে সর্বদাই ফিরিত একটি সেতার এবং কণ্ঠে গানের আর বিরাম ছিল না। ... এই বৃদ্ধটি যেমন আমার পিতার, তেমনি দাদাদের,

তেমনি আমাদেরও বন্ধু ছিলেন। আমাদের সকলের সঙ্গে তাঁহার বয়স মিলিত। কবিতা শোনাইবার এমন অনুকূল শ্রোতা সহজে মেলে না। ঝরণার ধারা যেমন এক টুকরো নুলি পাইলেও তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিয়া মাত করিয়া দেয়, তিনিও তেমনি যে কোন একটা উপলক্ষ পাইলেই আপন উল্লাসে উদ্‌বেল হইয়া উঠিতেন। " জীবন স্মৃতি,পৃ. ৩৭ - ৩৮

শ্রীকণ্ঠবাবু যখন সংগীতের আনন্দে লীন হয়ে যেতেন আর নাচতে নাচতে সেতার বাজাতেন; হাসিতে চোখে চমক উঠত। অনেক গানের প্রভাবই কিছু এমন ছিল যা ওনাকে শেখাতে হ'ত না লোক আপ্‌না আপনি শিখে যেত। কেবল গায়ক বলেই যে তিনি বন্ধু হতে পেরেছিলেন তা নয় তাঁর সহজ সরল, মধুর ও উদার চরিত্রই সবাইকে আকৃষ্ট করত। সামান্য সময়ের মধ্যেই পরিবেশকে পাল্টে দিতে পারতেন। এই অসীম ক্ষমতা তাঁকে বৃদ্ধ, যুবক, শিশুকে বন্ধু হতে সাহায্য করত।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে নিয়ম করে গান শেখেননি।

৩৯৬। রবীন্দ্রনাথের জীবনে যদুভট্টের প্রভাব সম্বন্ধে লেখ।

উঃ যদুভট্টের প্রতিভা ছিল সৃষ্টি ধর্মী। ব্রাহ্ম সমাজ থেকে নিমন্ত্রণ পান গান গাওয়ার জন্য। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যদুভট্টের গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ঠাকুর পরিবারের সংগীত শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন খুব ছোট। রবীন্দ্রনাথের দাদারাই মূলতঃ যদুভট্টের শিষ্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় " যখন আমার কিছু বয়স হয়েছে তখন বাড়িতে খুব বড় এসে বসলেন যদুভট্ট। ... যদুভট্ট আমাদের গানের মাস্টার, আমাদের বাড়ির সভাগায়ক, — একটা মস্ত ভুল করলেন, জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই। ... কোনরকম শেখার ব্যাপারে আমার টিকিটিও খুঁজে পাবার যো ছিল না। ... আমি অত্যন্ত 'পলাতক' ছিলুম বলে কিছু শিখিনি, নইলে কি তোমাদের কাছে খাতির কম হত। ... আড়ালে-আবডালে থেকে যেটুকু শুনেছি — সেটুকুই আমার শেখা। যদুভট্টের কাছে থেকেও তেমন কিছু-কিছু সংগ্রহ করেছিলাম লুকিয়ে চুরিয়ে। ভাল লাগলো কাফি সুরে 'রুমঝুম বর মে আজু আদরওয়া—' রয়ে গেল আজু পর্যন্ত আমার বর্ষার গানের সঙ্গে দল বেঁধে। ... তার থেকেই পেয়েছি আমি গানের প্রেরণা। বর্ষার দিনে ভিতরে ভূপালী সুরের আলাপ চলছে, আমি বাইরে থেকে শুনেছি। আর কি আশ্চর্য, পরবর্তী জীবনে আমি যত বর্ষার গান রচনা করেছি তার প্রায় সবকটিতেই অদ্ভুতভাবে এসে গেছে ভূপালীর সুর। কাজেই সংগীত শিক্ষাটা আমার সংস্কারগত। — ধরাবাঁধা রুটিনমাফিক নয়" — (রবীন্দ্র সংগীত সুষমা)

প্রকৃত সংগীত শিক্ষার প্রথম মাধ্যম হল শ্রবণ। কোন সুরের মুর্ছনাকে প্রথমে মন প্রাণ দিয়ে শুনতে হয়। পরে তার প্রকাশ হয় কণ্ঠের মধ্যে দিয়ে। সে কারণে

রবীন্দ্রনাথ যদুভট্টের কাছে ঋণী। যদুভট্টের বহু গানের প্রতিফলনই পাই রবীন্দ্র সংগীতে। যেমন কবি রচিত ব্রহ্ম সংগীত "আজি বহিছে বসন্তপবন"(রাগবাহার তাল তেওড়া — স্ব,বি— ২৩) মূল গান "আজু বহত বসন্তপবন" এর অবলম্বনে। যদুভট্টের "ফুলি বন ঘন ওর আয়ে বসন্ত রি" (বাহার, চৌতাল) গানের অনুকরণে কবি রচনা করেন, "আজি মম মন চাহে" (বাহার, চৌতাল, স্বরবিতান — ৪)। যদুভট্টের গাওয়া একটি গান, "রুমুঝুমু বরসে বদরবা পিয়া বিদেশ মোরী"। "এই গানের আধারে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ তিন ভাই গান রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গান ছিল "শূন্যহাতে ফিরি হে নাথ পথে পথে" এই গানটি (স্বরবিতান —৪) রাগ - কাফী, তাল সুরফাঁকতাল। যদুভট্ট সম্পর্কে কবি বলেছেন, তিনি ওস্তাদ জাতের চেয়ে ছিলেন অনেক বড়। তাঁকে গাইয়ে বলে বর্ণনা করলে খাটো করা হয়। তাঁর ছিল প্রতিভা, অর্থাৎ সংগীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করতো। তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা অন্য কোন হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না। তাঁর মতো সংগীত ভাবুক আধুনিক ভারতে কেউ জন্মেছেন কিনা সন্দেহ।" — (ভারতীয় সংগীতের কথা পৃঃ— ১৯৮)

৩৯৭। রবীন্দ্রনাথের জীবনে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর প্রভাব সম্বন্ধে লেখ।

উঃ রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী ছিলেন ঠাকুর পরিবারের শ্রেষ্ঠ সংগীত শিক্ষক। রাধিকা প্রসাদ খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। রাধিকা গোস্বামীর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন"...সকলেই জানেন রাধিকা গোস্বামীর কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগ-রাগিণীর রূপজ্ঞান ছিল তা নয়, তিনি গানের মধ্যে বিশেষ একটি রস সঞ্চার করতে পারতেন। যেটা ছিল ওস্তাদের চেয়ে কিছু বেশি।" (প্রবাসী অগ্রহায়ন ১৩৩৫) 'বিষ্ণুপুর ঘরানা'র এক সুযোগ্য সংগীত শিক্ষক ছিলেন রাধিকা গোস্বামী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত "ভারতীয় সংগীত সমাজ"-এর আচার্য্যের পদ অলংকৃত করেন তিনি।

৩৯৮। ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধে যা জান লেখ।

উঃ কিশোর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ অতীত ভারতের গীতি ও কবিতাগুলির প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর ভাষায়, "আমার বয়স তের-চৌদ্দ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণবপদাবলী পাঠ করেছি, তার ছন্দ, রস, ভাষা, ভাব সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করত। যদিও আমার বয়স অল্প ছিল তবু অস্পষ্ট অস্ফুট রকমেও বৈষ্ণবধর্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশলাভ করেছিলুম।" — ('প্রবাসী' ১৩৩৪ পৌষ)।

কবি, শ্রী অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদা চরণ মিত্রের সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ'